রাষ্ট্র বনাম মিসেস হেলেনা পাশা ও অন্যান্য (ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩) মামলাটি নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও সুপারিশ

গত ২৩/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদপত্রে ***রাষ্ট্র বনাম হেলেনা পাশা ও অন্যান্য*** (জেলা ড্রাগ আদালত ও বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা; ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩) মামলার রায় ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়। রায়ে আসামীদের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

তবে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, উক্ত মোকাদ্দমাটি নিষ্পত্তি হতে ২১ (একুশ) বৎসর এর অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও পীড়াদায়ক যে, প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে শিশুদের মৃত্যুর অভিযোগের বিচার সম্পন্ন হতে বিচারিক আদালতের ২১ বছর প্রয়োজন হল।

যেহেতু, বাংলাদেশের মোকাদ্দমা সমুহের নিষ্পত্তিতে 'দীর্ঘসুত্রতার কারণ নির্ধারণ' আইন কমিশনের অন্যতম কার্যক্রম, সে কারণে এই মোকাদ্দমাটি নিষ্পত্তিতে এতটা সময় কেন প্রয়োজন হল তা নির্ধারণ করার জন্য মোকদ্দমাটির মুল নথি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে জ্ঞাত করে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য মহোদয়গণ এবং মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা বিগত ১১-০৮-২০১৪ খ্রি. তারিখে বিকাল ০৪ (চার) টায় সংশ্লিষ্ট জেলা ড্রাগ আদালত ও বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের চেম্বার কক্ষে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি সমুহ পরীক্ষা করেন।

প্রতীয়মান হয় যে, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর জনাব আবুল খায়ের নামীয় একজন কর্মকর্তা (তত্ত্বাবধায়ক) ১৯-১২-১৯৯২ খ্রি. তারিখে মিসেস হেলেনা পাশাসহ ০৮ (আট) জনের বিরম্নদ্ধে দি ড্রাগস (কন্ট্রোল) অডিন্যান্স ১৯৮২ এর ১৬ (সি) ও ১৭ ধারা অনুসারে একটি Complaint Petition দাখিল করেন।

বিজ্ঞ আদালত ২-১-১৯৯৩ খ্রি. তারিখের ১ নং আদেশে ৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে উপরিউক্ত আইনের বিধান অনুসারে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন। ২৩-১-১৯৯৩ খ্রি. তারিখে কয়েকজন আসামী হাজির হন। অবশিষ্ট পলাতক আসামীদের বিরম্নদ্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ ২০-২-১৯৯৩ খ্রি. তারিখে প্রদান করা হয় (আদেশ নং: ৪)।

২৮-০৫-১৯৯৪ খ্রি. তারিখে ৫ (পাঁচ) জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় (আদেশ নং: ১৫)।

২৮-৮-১৯৯৪ খ্রি. তারিখের ১৯ নং আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারি রিভিশন নং ১২০৪/১৯৯৪ এর আদেশ সুত্রে মামলাটির নথি হাইকোর্টে তলব করা হলে তা তলব মতে প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর দীর্ঘ সময় মামলাটির বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকে।

২০-১০-২০০৯ খ্রি. তারিখের ২০ নং আদেশদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মহোদয় অফিস পরিদর্শন কালে আলমারীতে নথিটি তাঁর দৃষ্টি গোঁচর হয়। তিনি দেখেন যে, হাইকোর্ট বিভাগ হতে নথিটি ৫-১১-২০০৭ খ্রি. তারিখে বিচারিক আদালতের অফিসে গৃহীত হয়, কিন্তু বিষয়টি সেরেস্তা সহকারী গোপন রাখে এবং বিজ্ঞ বিচারকের সম্মুখে নথিটি পেশ করে নাই। অতঃপর উক্ত সেরেস্তা সহকারীকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়।

পুনরায় দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর মামলার কার্যক্রম শুরু হলে ২৮-০৬-২০১০ খ্রি. তারিখে বিচারের জন্য ধার্য থাকলেও রাষ্ট্রপক্ষ কোন সাক্ষী হাজির করে নাই (আদেশ নং ২৮)। আরও ৪ (চার) মাস পরে ২০-১০-২০১০ খ্রি. তারিখে চড-১এর সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয় (আদেশ নং ৩১)। এরপর কোন তারিখে আসামীপক্ষে মুলতবী আবেদন, কোন তারিখে সাক্ষী অনুপস্থিত, একবার সাক্ষীর বরাবরে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী এইরূপ নানা পদক্ষেপের পর চড-১এর জেরা ৭ (সাত) মাস পরে ২-৫-২০১১ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয় (আদেশ নং ৩৭)। ২য় সাক্ষীর সাক্ষ্যের দিন ধার্য করা হয় ১-৬-২০১১ খ্রি. তারিখে কিন্তু ঐ তারিখেও সাক্ষী হাজির হয় নাই। ২৪-১০-২০১১ খ্রি. তারিখে ০৩ (তিন) জন আসামী পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়।

অতঃপর ৩-১-২০১২ খ্রি. তারিখে চড-২ এর সাক্ষ্য আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য সাক্ষীদের গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয় (আদেশ নং ৪৩)।

পরবর্তীতে ২-২-২০১২, ১৫-৩-২০১২, ৩০-৪-২০১২, ৩১-৫-২০১২, ৩-৭-২০১২ ,৫-৮-২০১২ খ্রি. তারিখসমুহে সাক্ষী অনুপস্থিত এবং প্রত্যেক তারিখেই সাক্ষীদের প্রতি গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করার আদেশ হয়েছে।

অতঃপর, ৩০-০৮-২০১২ খ্রি. তারিখে চড-৩এর সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয় (আদেশ নং ৫০)। এরপর, ১০-০৯-২০১২, ২৭-০৯-২০১২, ৫-১১-২০১২, ০৯-০১-২০১৩ খ্রি. তারিখসমুহে সাক্ষী অনুপস্থিত থাকে এবং প্রত্যেক তারিখেই গ্রেফতারী পরওয়ানা জারীর আদেশ হয়। ২৮-১-২০১৩ খ্রি. তারিখের আদেশ থেকে জানা যায় যে সাক্ষী আব্দুল মালেক মৃত (আদেশ নং ৫৫)।

২২-০৫-২০১৩ খ্রি. তারিখে চড-৪এর সাক্ষ্য আংশিক গ্রহণ করা হয়, পরবর্তী ২৯-০৫-২০১৩ খ্রি. তারিখে তার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয় (আদেশ নং ৬১)।

২৬-০৬-২০১৩ খ্রি. তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামীকে পরীক্ষা করা হয় এবং যুক্তিতর্ক আংশিক শুনানী হয় (আদেশ নং ৬২)।

১৮/৭/২০১৩ খ্রি. তারিখে রাস্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট শুনানী মুলতবী করা হয় (আদেশ নং ৬৩)।

অতঃপর, আসামীপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭/৮/২০১৩, ২৭/১০/২০১৩, ২১/১১/২০১৩, ২৮/১/২০১৪, ২৫/০২/২০১৪, ২০/০৩/২০১৪, ২১/০৪/২০১৪, ১৯/০৬/২০১৪ ও ৩/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখসমূহে অবশিষ্ট যুক্তিতর্ক শুনানী মুলতবী হয়। অবশেষে যুক্তিতর্ক শুনানী আরম্ভ হওয়ার ১৩ (তের) মাস পরে ১০/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে যুক্তিতর্ক শুনানী সমাপ্ত হয়।

১৭/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে আসামীগণ অনুপস্থিত থাকায় রায় প্রদান স্থগিত থাকে। অতঃপর, ২২/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়। (আদেশ নং ৭৬)

এই মামলার গুনাগুন (merit) বা রায় আইন কমিশনের বিবেচনার বিষয় নয় তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে অত্যধিক মামলার জট এবং দীর্ঘসুত্রতার বিভিন্ন ঘটনা এবং উহার কারণ অনুসন্ধান এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা দায়েরের দেড় বছরের মাথায় ২৮/৫/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে অভিযোগ গঠন করা হয় যদিও অভিযোগ গঠনে এত বিলম্ব বাঞ্ছনীয় ছিল না। অভিযোগ গঠনের পরেই মুলত বিচার বিলম্বিত হবার সমস্যা আরও প্রকট আকারে দেখা দেয়।

২৮/৮/১৯৯৪ খ্রি. তারিখের আদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মামলার ৩ জন আসামীর আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ উপরোক্ত অভিযোগ গঠন সংক্রান্ত আদেশের বৈধতা প্রশ্নে ***Criminal Revision No. 1204 of 1994*** মোকদ্দমায় একটি ***Rule*** জারী করে । ***Rule*** এর কোন কপি বিচারিক আদালতে রক্ষিত নথিতে পাওয়া যায় নাই। তবে ***Cr.Rev. No. 1204 of 1994*** এর নিস্পত্তির রায়ের একটি কপি নথিতে রক্ষিত আছে।

রায়ের কপি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি ক্রিমিনাল রিভিশনটি ১৪ (চোদ্দ) বছর পর বিগত ২৮/৩/২০০৭ খ্রি. তারিখের রায়ের দ্বারা নিস্পত্তি হয়। রিভিশন মোকাদ্দমাটি শুনানীর সময় আবেদনকারী আসামীপক্ষের এ্যাডভোকেট মহোদয় শুনানীতে অংশ গ্রহণ পর্যন্ত করেন নাই। মাননীয় বিচারপতি তাঁর দেড় পৃষ্ঠার রায়ে ***Rule*** টি খারিজ ***(Discharge)*** করতে গিয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

> The offence discloses is very heinous as it relating to the life of infants who were treated at different hospitals. It is a crime against the society as such the trial should be held to find out whether the allegations are true or not. We find no substance in the rule.
>
> In the result, the rule is discharged.
>
> Order of stay granted earlier by this court is vacated.
>
> Send down the lower court records at once .

প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে ***Rule*** টিতে যখন কোন ' ***substance*** ই নাই তখন ***Rule*** টি জারী হল কেন, যার ফলশ্রুতিতে বিচারিক আদালতে মামলাটির শুনানী ১৪ (চোদ্দ) বছর পিছিয়ে গিয়েছিল; কারণ ***Rule*** জারীর সময় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মুল মামলার নথিটি তলব করা হয় এবং মামলাটির কার্যক্রম ১৪ বছর বন্ধ থাকে। এই ঘটনা আমাদের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় বহন করে। বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য, " Justice Delayed Justice denied" এর জলন্ত প্রমাণ ।

আরও প্রতীয়মান হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগের রায়টি ২৮/৩/২০০৭ খ্রি. তারিখে ঘোষণা করা হলেও রায়ের কপি ও বিচারিক আদালতের নথিটি রায় ঘোষণার প্রায় ৬ মাস পরে হাইকোর্ট বিভাগের ১২/৯/২০০৭ খ্রি. তারিখের মেমো মারফৎ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বিচারিক আদালতের ২০/১০/২০০৯ খ্রি. তারিখের ২০ নং আদেশে প্রতীয়মান হয় যে নথিটি ৫/১১/২০০৭ খ্রি. তারিখে বিচারিক আদালতে গৃহীত হয়। হাইকোর্ট বিভাগ থেকে মাত্র ২ (দুই) মাইল দুরে ঢাকাস্থ বিচারিক আদালতে পৌঁছাতে নথিটির ২ (দুই) মাস সময় লাগে। এই ধরণের সময় ক্ষেপণ অবশ্যই ইচ্ছাকৃত এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তদের প্রয়োজনীয় তদারকীর অভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বিচারিক আদালতে নথি ৫/১১/২০০৭ খ্রি. তারিখে গৃহীত হবার পর আলমারিতেই থাকে আরও প্রায় ২ (দুই) বছর। বিজ্ঞ বিচারক অফিস পরিদর্শন না করলে আরও কত বছর পড়ে থাকত তা বলা মুস্কিল। সন্দেহ নাই এটাও ইচ্ছাকৃত । সেরেস্তা সহকারী আব্দুল হক শেখকে কারণ দর্শান নোটিশ দেয়া হলেও এ সম্পর্কে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নাই। এত বড় অপরাধের জন্য তার বিরম্নদ্ধে কোন বিভাগীয় কার্যক্রম দ্বারা শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

বিচারিক আদালতের অর্ডার সিট্ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ২৮/৬/২০১০ খ্রি. তারিখে মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হলেও ঐ দিন সাক্ষী হাজির হয় নাই। ৪ (চার) মাস পর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। সাক্ষীকে বারবার গ্রেফতার এর নির্দেশ প্রদান করতে আদালত বাধ্য হয় এবং প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করতেই প্রায় ৭ (সাত) মাস লাগে। ২য় সাক্ষীর সাক্ষ্য ৩/১/২০১২ খ্রি. তারিখে গ্রহণ করা হলেও পুণ: পুণ: গ্রেফতারী পরওয়ানা জারীর প্রায় ৮ (আট) মাস পর ৩০/৮/২০১২ খ্রি. তারিখে ৩য় সাক্ষী হাজির হলেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাস তাহার অনুপস্থিতির পর ২৮/০১/২০১৩ খ্রি. তারিখে জানা যায় যে, তিনি ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। নানা বিবিধ কারণে ৪ (চার) মাস পরে ২৯/৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। অথচ উক্ত ৩ (তিন) সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ এক দিনেই শেষ করা সম্ভব ছিল। ২৬/৬/২০১৩ খ্রি. তারিখে আসামীদেরকে ফৌজদারি কার্যবিধি এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। ঐ তারিখেই উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক আংশিক শ্রবণ করা হয়।

এরপর, ২৭/৮/২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে আসামী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মোট ১০ (দশ) বার আংশিক যুক্তিতর্ক শুনানী মুলতবী হয়ে ১১ (এগার) মাস পরে ১০/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে আসামী পক্ষ যুক্তিতর্ক সম্পন্ন করে (আদেশ নং ৭৫)। এতবার শুনানী মুলতবি করা অযৌক্তিক এবং কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না।

উপরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই মামলা সমাপ্ত করতে প্রায় ২১ বছর ৭ মাস অতিবাহিত হয়েছে। নিম্নে ছকদ্বারা বিলম্বের কারণ ও দায়িত্বহীনতার মাত্রা আরও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা হল:

১.	হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারি রিভিশন মামলা নং ১২০৪/২০০৪ এ রুলনল ইস্যুর মাধ্যমে বিচারিক আদালতের নথি তলব করার কারণে	১৪ বৎসর ৩ মাস
২.	ফৌজদারি রিভিশন নিষ্পত্তির পর নথি বিচারিক আদালতের সেরেস্তা সহকারি বিচারক মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন না করে আলমারিতে রেখে দেয়ার কারণে	১ বৎসর ১১ মাস
৩.	প্রসিকিউশন কর্তৃক সাক্ষী হাজির না করায়	২ বৎসর ০১ মাস
৪.	আসামী পক্ষে সময় প্রার্থনা করে যুক্তিতর্ক মুলতবি করায়	১১ মাস
৫.	অহেতুক মোট অপব্যয়িত সময়	১৯ বৎসর ২ মাস

উপরিউক্ত ঘটনাবলী এবং অপব্যয়িত সময়ের হিসাব হতে প্রতীয়মান হয় যে, অহেতুক কালক্ষেপণ না হলে দুই/ আড়াই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৫ সনের মধ্যে মামলাটির রায় তথা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশের সার্বিক বিচার ব্যবস্থা বিশেষ করে হাইকোর্ট বিভাগে case management এর চরম ব্যর্থতার কারণে এদেশের ভিকটিম বা তদের আত্মীয় স্বজন দেড় যুগ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, অপর ড্রাগ কেস নং ২/১৯৯৩ এবং ৩/১৯৯৩ মামলাগুলি একইভাবে যথাক্রমে ***Criminal Revision No. 1279 of 1994 I Criminal Revision No. 1283 of 1994*** মোকদ্দমায় প্রায় ১৮ (আঠার) বছর স্থগিত ছিল। হাইকোর্ট বিভাগে ২০/০২/২০১১ খ্রি. তারিখে উপরোক্ত রিভিশন মোকদ্দমাগুলি খারিজ হওয়ার পর আরও ১ (এক) বছর লেগেছে বিচারিক আদালতে নথি পৌঁছতে। ফলে মামলাটি বিচারাধীন থাকার মেয়াদ ১৯ (উনিশ) বছরে গিয়ে দাঁড়ায়। মামলা দায়েরের ২১ (একুশ) বছর পর উপরোক্ত ড্রাগ মামলা দুইটির সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান আগষ্ট মাসে শুরু হয়েছে মাত্র।

ভবিতব্যই জানেন এই মামলা দুটির সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদৌ কোন সাক্ষী পাওয়া যাবে কিনা এবং কবে নাগাদ মামলা দুটি সমাপ্ত হবে।

আরও উল্লেখ্য যে, ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩ কেবল বিচারিক আদালতে ২২/৭/২০১৪ খ্রি. তারিখের রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। এরপর, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল হতে পারে, এমন কি আপীল বিভাগেও যেতে পারে। মামলার কার্যক্রম সম্পন্ন হতে যে পরিমান সময় এ পর্যন্ত লেগেছে তাতে এই মামলা চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে আরও কত বছর

লাগতে পারে তা অনিশ্চিত। এটা নগ্ন সত্য। এই বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের মালিক জনগণের নিকট লজ্জায় মুখ লুকানো ছাড়া আমাদের আর গত্যান্তর নাই।

এ ধরণের অসহনীয় বিচারিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দেশের ও জাতির স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। যদিও এ ধরণের সংস্কার তাৎক্ষনিকভাবে করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখনই এর সুচনা করা আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক সুপারিশ করা হল:

১। বিচারিক আদালতে সাক্ষী হাজির করতে দায়িত্বশীলভাবে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং service return আদালতে দিতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে সাক্ষী কেন আসছে না। প্রয়োজনে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

২। ফৌজদারি মোকাদ্দমায় সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদানসহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, যেমন, শৌচাগারসহ বসবার জায়গার ব্যবস্থা করা, রাহা খরচ প্রদান, অর্থাৎ তাদের আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ,

৩। অনেক সময় সাক্ষী উপস্থিত হলেও আদালতে হাজির করা হয় না, এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ,

৪। সাক্ষী উপস্থিত হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক কারণ ভবিষ্যৎতে নানা কারণে পুনর্বার তিনি উপস্থিত নাও হতে পারেন, যেমন:

ক) মৃত্যুজনিত কারণ,

খ) আসামীপক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া,

গ) নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা,

এই সব কারণে উপস্থিত হওয়া সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

৫। বিচারককে নিজ হাতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে হয় বিধায় তাঁদের পক্ষে অধিক সময় সাক্ষ্য গ্রহণ হয়তো সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সাক্ষ্য গ্রহণ ও তা লিপিবদ্ধ করতে বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও আধুনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,

৬। ফৌজদারি কার্যবিধি ও ফৌজদারি রুলস ও অর্ডারস এর বিধান অনুসারে মামলার বিচারকাজ মুলতবী ব্যতিরেকে একটানা সম্পন্ন করা,

৭। অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতিরেকে শুনানী মুলতবী না করা, মুলতবী করলেও স্বল্প সময়ের জন্য মুলতবী করা,

৮। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রুল ও স্থগিতাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি অহেতুক রুল জারি করাকে দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করতে পারেন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রহণ করে স্থগিত আদেশ সম্বলিত ***Rule*** দ্রুত নিস্পতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন,

৯। রুল জারী করা হলেও সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি না হলে তাহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হবার বিধান করা যেতে পারে,

১০। একটি রুল জারীর অর্থ একটি নুতন মামলা সৃষ্টি। এরূপ অবস্থায় নুতন মামলা সৃষ্টির পরিবর্তে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানে বিভিন্ন বেঞ্চ গঠন ও পুনঃগঠন করা প্রয়োজন,

১১। হাইকোর্ট বিভাগে কেবল অধিক সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ প্রদানে মামলার সংখ্যা কমছে না। গত ১৪ বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হবে যে, বিচারপতিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামলার সংখ্যা হ্রাস হবার পরিবর্তে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; এ দেত্রে প্রতিকার মুলক ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন; যেমনঃ

ক) মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিগণকে বিচারপতিপদে নিয়োগ প্রদান;

খ) সুপ্রীম কোর্টে অন্যুন কুড়ি বছর এ্যাডভোকেট হিসাবে প্রকৃত কার্যকাল, অথবা বিচার বিভাগে অন্যুন কুড়ি বছর প্রকৃত বিচারিক দায়িত্ব পালন এবং তন্মধ্যে অন্তত তিন বছর জেলা জজের প্রকৃত দায়িত্ব পালন,

গ) বিচারপতি পদে নিয়োগে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) বছর বয়স এবং অবসর গ্রহণের বয়স ৭৫ (পঁচাত্তর) বছর নির্ধারণ করলে অভিজ্ঞ বিচারক দক্ষতার সাথে অধিক সময় বিচারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন এবং জাতি উপকৃত হবে। এই বিধান কেবল নুতন নিয়োগ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে।

১২। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। অভিজ্ঞ বিচারপতি মহোদয়গণকে দায়িত্ব দিয়ে হাইকোর্ট বিভাগ ও জেলা আদালতগুলিকে ক্রমাগত তদারকি করলে সুফল হতে পারে।

১৩। উচ্চ আদালত ও জেলা পর্যায়ের আদালতসমুহে কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিঘ্ন বা বিলম্ব ঘটলে "গুরুতর পেশাগত অসদাচারণ" বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস। যা বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সকল বিভাগকে তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে উদ্‌বুদ্ধ ও সচেষ্ট করবে।

১৫। প্রায়ই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে অকারণে বিচার বিভাগীয় গুরুত্বপুর্ণ আদালত সমুহে বিচারক নিয়োগ প্রদান অস্বাভাবিক ভাবে বিলম্বিত হয়। শুন্য আদালতে বিচার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে অচল হয়ে যায়। প্রশাসনিক শৈথিল্য অনেক ক্ষেত্রে বিচার বিলম্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিধায় দ্রুততার সাথে শুন্য আদালতে বিচারক নিয়োগ/বদলি করা আবশ্যক।

১৬। জেলা ও দায়রা জজ পর্যায়ের বিচারকগণ তাহাদের অধীনস্থ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকবেন। তাঁহারা প্রতি মাসে অন্তত একবার সকল বিচারকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করে কিভাবে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা যায় তাহা আলোচনা করবেন, নির্দেশনা দেবেন, প্রয়োজনে প্রশাসনিক আদেশ প্রদান করে সকল আদালতে মামলা সুসমভাবে বন্টন করবেন।

(প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম)
সদস্য

(বিচারপতি এ.টি.এম ফজলে কবীর)
সদস্য

(বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান